তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী

স্নিগ্ধা রায়

"রূপকথা- শোনা নিভৃত সন্ধেবেলা
সংসার থেকে গেল চলে,
আমাদের স্মৃতি
আর নিবে যাওয়া তেলের প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে।"

কবিগু রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছিলেন তাঁর 'পিলসুজের উপর প্রদীপ' কবিতায়। বাস্তবিকই একথা আজ আরো অনেক বেশী সত্যি হয়ে উঠেছে। 'রূপকথা-শোনা নিভৃত সন্ধেবেলা গুলো সংসারে আর দেখা যায় না। চারদিকে আধুনিক গণমাধ্যমের লোভনীয় হাতছানি। বর্তমানে বিজ্ঞান ও 'হাইটেক' প্রযুক্তির নব নব আবিষ্কারের ফলে চোঁখ ধাঁধানো বৈদ্যুতিক আলোয় গগনচুম্বি অট্টালিকার এক ছোট্ট ফ্ল্যাটে টিভির কেব্‌ল চ্যানেলের কৌতূহল সঞ্চারী আকর্ষণ শিশুদের মোহাবিষ্ট করে রাখে। নয়া প্রজন্মের মা-বাবা শিশুদের সুস্থ, সাংস্কৃতিক বুনিয়াদের উপর দাঁড় করাতে চাইলে, তাদের মানসিক বিকাশ স্বাভাবিকভাবে ঘট াতে চাইলে শিশুদের রূপকথার জগতে ছড়ার জগতে পৌঁছে দিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন —

'ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নতুন পরিবর্তনহইয়াছে কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বের যেমন ছিল আজও তেমনি আছে, সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারম্বার মানবের ঘরে শিশু মূর্তি ধরিয়া জন্ম গ্রহণ করিতেছে অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন যেমন সুকুমার যেমন মূঢ় এবং ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে।'

দুঃখের বিষয় শিশুর আজকাল 'তেপান্তরের পাথর' পেরিয়ে রূপকথা শোনার সুযোগ পায় না। অথচ শিশুরা কল্পনাশক্তির বিকাশে মানসিক গঠনে শিশুদের কাছে শিশু মন নিয়ে রূপকথা, শিশুদের ছড়া ইত্যাদি শেখান প্রয়োজীনই শুধু নয় আমার মতে অপরিহার্য।

কবিগু রবীন্দ্রনাথ আবালবৃদ্ধবনিতা সবার জন্যে সব বয়সের মানুষের জন্যে কবিতা লিখেছেন। যেমন তিনি যৌবনের গান গেয়েছেন, বেলাশেষের গান গেয়েছেন, তেমনি শৈশবের মাধুর্যও ফুটিয়ে তুলেছেন সুনিপুণ লেখনীতে। 'কবিতায় বয়স' কবিতার কবি বলেছেন —

'পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক বয়সী জেন।'

সত্যিই তিনি সবার সমবয়সী ছিলেন। শিশুর মত মন নিয়ে সৃষ্টি করেছেন 'শিশু' কাব্যগ্রন্থ, 'শিশু ভোলানাথ', শিশুদের জন্যে একাধিক ছড়া ইত্যাদি। আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয় রবীন্দ্র দৃষ্টিতে শিশু। শিশুমনের রহস্যের প্রতি শৈশব থেকেই কবির প্রবল অনুসন্ধিৎসা ছিল। 'জীবনস্মৃতি'-তে তাঁদের পুষ্করিণীর কাছে বট গাছের উদ্দেশে কবি বলেছেন —

'নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট'
ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে ওগো প্রাচীন বট?

'ছবি ও গান' থেকেই বস্তুত শিশু-বিষয়ক কবিতার শু। অনুবাদের আকারে শিশু-বিষয়ক কবিতা প্রথম দেখা যায় প্রভাত সংগীতে। স্ত্রী-বিয়োগের পর মধ্যমা-কন্যাকে একবছরের মধ্যে হারিয়েছেন কবি। বায়ু পরিবর্তনের জন্যে তিনি আলমোড়া পাহাড়ে ছিলেন তখন একটি নতুন কাব্য সেখানে রচনা করেন। তার নাম 'শিশু'। পীড়িতা কন্যা, মাতৃহীন শিশুপুত্র শমী কবির কাছে মা-বাবা দুজনেরই স্নেহ পেয়েছিল। সেই আন্তরিক স্নেহ — উৎসারিত বাৎসল্য রসে পূর্ণ শিশু হৃদয়ের সুখ-দুঃখে পূর্ণ এই কাব্য শিশু জীবনের আনন্দলোককে উদ্‌ঘাটিত করেছে। শিশুদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ যে কী অপরিসীম ছিল কবির সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছেন তাঁরাই জানেন। বাড়ীতে 'ভাইবোন-সমিতি' স্থাপন করে ছোট ছোট ভাইপো, ভাইঝি,ভাগ্নে, ভাগ্নিদের নিয়ে যে সব আনন্দ-উৎসব হতো কবির উৎসাহই ছিল সেখানে সবচেয়ে বেশী। শৈশবে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের জন্যে 'বালক' পত্রিকা প্রকাশিত হলে কবিই ছিলেন তার প্রধান লেখক। শিশুমনকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে প্রথম মহোৎসব চলে সেখানে। নানান কাজের ফাঁকে শিশুদের মনোরাজ্যে প্রবেশ করার জন্যে কবিচিত্ত উৎসুক হয়ে উঠল। সৃষ্টি হলো 'শিশু' কাব্য। এ সময়কার কবির একটি চিঠিতে আছে "আমি আজকাল শিশুদের মনের ভিতর বাসা করে আছি। তেতলায় ছাদের ওপর আমার নিজের শৈশব মনে পড়ছে।" কবি লিখলেন —

"খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে
আমি যদি পারি বাসা নিতে
তবে আমি একবার
জগতের পানে তার
চেয়ে দেখি বসি সে নিভৃতে।"

আর একখানি পত্রে লিখেছেন — "যতই লিখছি নিজের ভিতর যে বাল কাণ্ড আছে তার সঙ্গে পরিচয় ততই বেড়ে যাচ্ছে।" আলমোড়ায় রচিত 'শিশু'-র প্রথম

কবিতার প্রথম স্তবক -
"জগৎ পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
অন্তহীন গগনতল
মাথার ওই সুনীল জল
নাচিছে সারা বেলা।
উঠিছে তটে কী কোলাহল —
ছেলেরা করে মেলা।"
কবি তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে শিশু মনের এবং শিশুর সঙ্গে মা-বাবার যে নিগূঢ় সম্বন্ধের চিত্রগুলি এঁকেছেন তার মূল কথাটি হচ্ছে মাধুর্য। এই তত্ত্বটি বাবার দৃষ্টি নিয়ে দেখে কবি লিখেছিলেন'কেন মধুর' কবিতাটি। শিশু -স্নেহ কেন এত মধুর এই প্রসঙ্গে কবির উক্তি — "খোকাকে যখন আমরা সমস্ত রঙিন সুন্দর ও মদুর জিনিষ দিয়া খুশী হই তখন বুঝিতে পারি আমাদের জগৎটা কেন এমন রঙিন, সুন্দর এবং মধুর হয়েছে। জগতের অস্তিত্বের পক্ষে মাধুর্যটা সম্পূর্ণ অতিরিক্ত। ওর কোন তাৎপর্য পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের সবরকম ভালবাসার উপলক্ষেই সৌন্দর্যের বিকাশ আমাদের কাছে চরম আবশ্যক। ভালোবাসা না থাকলে সৌন্দর্যের কোন অর্থই থাকে না। মধুর হওয়া, মধুর করা — প্রেমেরই চেষ্টা, স্নেহেরই আবেগ। ওটা শুদ্ধমাত্র সত্যের প্রয়োজনের বাইরে। ..... আমরা যখন নিজে ভালোবেসে মধুর হই — মাধুরী দিই — মাধুরী লাভ করি তখনই তার তাৎপর্য বুঝতে পারি।"
'শিশু' কাব্যখণ্ডে কবি শিশুমনের বিচিত্রতার বিভিন্নস্তরের রূপ সহজ ছন্দে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা ছোট—বড় সকলেরই উপভোগ্য। এই শিশুর মনের সঙ্গে খেলা তাঁর সারা জীবন চলেছিল। কবির ডুবুরী-হৃদয় শিশুজীবনের রহস্যের গভীরতার পরিমাপ করতে গিয়ে অনেক মণিমুক্তো উদ্ধার করেছেন। 'জন্মকথা' কবিতাটিতে শিশু ও মাতার মধ্যে রহস্যজনক সম্বন্ধটি কবিকে মুগ্ধ করেছে। শিশুর প্রশ্ন —
"এলেম আমি কোথা থেকে,
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?"
মা এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন -
"সব দেবতার আদরের ধন
নিত্য কালের তুই পুরাতন
।"
তারপরে —
"নির্নিমেষে তোমায় হেরে
তোর রহস্য বুঝি নে রে —
সবার ছিলি আমার হলি কেমনে?"
এই প্রশ্ন শুধু তার মায়ের নয়। সকলেরও এ রহস্যের রসে কত প্রশ্ন, বিস্ময়, বাৎসল্য ভাবের তরঙ্গ জেগেছে। কবিতায় তারই প্রশ্ন। পরিণত মানুষের পক্ষে সব সময় শিশুর মনস্বত্ত্ব বোঝা সহজ নয়, কবিরা খানিকটা পারেন, তাঁরা শিশুর স্বভাব-সরলতার পরিণত বয়সের চিন্তাশীলতাকে একত্র পেয়ে থাকেন। রূপকথার দেশে বাস্তব ও কল্পনার সীমা সুনির্দিষ্ট নয়। এই রূপকথার দেশের ভৌগলিক সংস্থান কোথায় তা জানা যায় না, তবে খুব সম্ভব যে সীমান্তে প্রকৃতির রাজ্য ও মানুষের রাজ্য মিলিত হয়েছে তার কাছেই হবে কিংবা কবির ভৌগলিক তত্ত্ব অনুসারে এটি জগৎমাতার ও জগৎপিতার রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ। খোকা এই জগৎমায়ের রাজ্যের ও বয়স্ক মানুষ জগৎপিতার রাজ্যের অধিবাসী।
খোকা থাকে জগৎমায়ের
অন্তঃপুরে

সত্য বুড়ো নানা রঙের
মুখোশ প'রে
শিশুর মনে শিশুর মতো
গল্প করে।

"খোকার তরে গল্প রচে
বর্ষা শরৎ —
খেলার গৃহ হয়ে ওঠে
বিশ্ব জগৎ"
এই তো সেই দেশ যেখানে জগৎমাতা খোকাকে খুশী করবার জন্যে তুলেছেন। শিশুর কাছে বাস্তব ও কল্পনার সীমা স্পষ্ট নয় বলেই তারপক্ষে যা ইচ্ছে তা হওয়া অসম্ভব নয়। শিশু বুঝতে পারে না—
"যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম তোমার টিয়ে"
কেনই বা মা তাকে শিকল কাটার দোষে গালি দিতেন। খোকার পক্ষে কুকুরছানা বা টিয়ে হওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি হঠাৎ চম্পা গাছে চাঁপা ফুল হয়ে ফুটে ওঠাও বিচিত্র নয়। দেশ ও কালের প্রচলিত সংস্কার হতে সে এতটা মুক্ত যে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না —
"রাতের বেলা দুপুর যদি হয়
দুপুর বেলা রাত হবে না কেন?"
শিশুচিত্তবিহারী কবি জানেন — ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে যেইখানে — সেখানে সাতমহলা কোঠায় তেপান্তরের পরপারবর্তিনী রাজকন্যা সোনার প

ালঙ্কে ঘুমোতে থাকেন। শৈশবে বাড়ীর ছাদের নিভৃত স্থানটি যে কবির কাছে খুব প্রিয় ছিল 'জীবন স্মৃতি' — তে তার উল্লেখ আছে।
'শিশু'র কবিতাগুলি কেবল বাংলা সাহিত্যে কেন জগৎ সাহিত্যে অতুল। শিশুর মনের এমন সুন্দর প্রকাশ করবার প্রয়াস বিশেষ দেখা যায় না, সেজন্য বিলেতে (শিশু) প্রকাশ হওয়ার পর সকলে বিস্মিত হয়েছিল। আসলে শিশু মনের কল্পনাশক্তির অশেষ পরিণতি ফুটিয়ে তুলবার জন্যে কেউ কবিতা লেখেননি। সে দিক থেকে 'শিশু' বাংলা সাহিত্যে নতুন পথ প্রদর্শন করেছে।
কবি এই দেশের শিশুর যে ছবি এঁকেছেন বারংবার দরত্বের রসে ভিজিয়ে এঁকেছেন। কবি শৈশবে ঈশ্বর ভৃত্যের অঙ্কিত গণ্ডির মধ্যে বসে থাকতে বাধ্য হতেন। সেই গণ্ডির বাইরে বৃহত্তর গণ্ডি ছিল দক্ষিণের বারান্দা এবং ছাদ। কল্পনা প্রবণ শিশু দূরত্বের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে ভাবনায় তার অভাব পূরণ করে নিত। এই জন্যে দূরত্বের প্রতি, অনির্দেশ রহস্যের প্রতি আকাঙ্খা ও আগ্রহ কবি জীবনের মূল সুর হয়ে উঠেছে। নিজের শৈশব স্মরণ করে দিগন্তশায়ী রূপকথার রাজ্যে নিয়ে গেছেন কবি শিশুদের।
খোকা খেলতে গিয়ে কালিঝুলি মাখে, কাপড়ে ছেঁড়ে, কিন্তু ছিন্নমেঘের প্রাতঃসূর্য কিম্বা মসীলিপ্ত পূর্ণিমা চন্দ্র কি আরো সুন্দর হয়ে ওঠে না তাতে? রবীন্দ্রনাথ নিজেকে যেভাবে দেখেছেন তার একটা অসাধারণত্ব আছে। তাতে খণ্ডতা, অসম্পূর্ণতা ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়ে পরম পরিপূর্ণ ভাবে উদ্ভাসিত। বিরোধ তাঁর বিশেষত্ব।
''মা যবে ছিল কিশোরী মেয়ে
কণ তাঁর পরান ছেয়ে
মাধুরী রূপে মুরছি ছিল — ''
মানব প্রকৃতির নিবিড়তর রহস্যের দ্বারে উপনীত কবি।
''হিরণময় কিরণ-ঝোলা
যাঁহার এই ভুবন দোলা
তপন-শশী-তারার কোলে
দেবেন এরে রাখি।''
এখানে আমরা বহিঃপ্রকৃতি ও মানস প্রকৃতির চরম আশ্রয়ে এসেছি।
এই ক্ষুদ্র শিশুটির জীবন উপলক্ষ করে কবি মানব, বিশ্ব ও বিশ্বনাথকে আত্মীয়তার সূত্রে গেঁথেছেন। যদিও মা-শিশুর বিশ্ব তবুও পৃথিবীর আকাশ, বাতাস সকলের সঙ্গে শিশুর পরিচয় হয়। পৃথিবীর বিচিত্র আহ্বানে তার ক্ষুদ্র প্রাণ স্পন্দিত হয়। কিন্তু মাকে বাদ দিয়ে কিছুই তার কাছে সত্য নয়। শিশু বলে .....
''মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে
তারা আমায় ডাকে, আমায় ডাকে।
.....
আমি বলি 'মা যে আমার ঘরে
বসে আছে আমার তরে,
তারে ছেড়ে থাকব কেমন করে।'
শুনে তারা হেসে যায় মা, ভেসে।
তার চেয়ে মা আমি হব মেঘ
তুমি যেন হবে আমার চাঁদ
দু-হাত দিয়ে ফেলব তোমায় ঢেকে,
আকাশ হবে এই আমাদের ছাদ।'' (মাতৃবৎসল শিশু)
বিখ্যাত 'বীরপুষ' কবিতায় খোকা মাকে অভয় দিয়ে বলে 'আমি আছি ভয় কেন মা করো'। বিপদ বারণ খোকার পুরস্কার মায়ের স্নেহচুম্বন —
'পাল্কী থেকে নেমে, চুমো-খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে।'
বহুকাল পরে শিশু ভোলানাথের মধ্যে 'পুতুল ভাঙা' ও 'মুর্খ' কবিতায় তৎকালীন পণ্ডিতদের সম্বন্ধে কবির তীব্র ক্ষোভ শিশুর জবানবন্দীতে প্রকাশ পেয়েছে। কবির মতে শিশুকে শিক্ষা দিতে হলে শিশু-মন নিয়েই তার কাছে যেতে হয়, তার কৌতূহলী কল্পনাপ্রবণ মনের খোরাক জোগাতে হয়। তার জন্যে চাই ছন্দোময় ছড়া, র পকথার রাজ্য। যেখানে শিশুর কলতানে ধ্বনিত হবে —
''সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে
আমি যাই ভেসে দূর দিশে —
পরীর দেশের বন্ধ দুয়ার দিই হানা মনে মনে।।'
পরীর দেশ থেকে শিশু কখনো বা এই মাটির পৃথিবীতে পল্লী বাংলার স্নিগ্ধ ছায়ায় তালদীঘিতে ফুলে সাজানো কেয়াপাতার নৌকা ভাসাতে গিয়ে গেয়ে উঠবে ছুটির গান —
''কী করি আজ ভেবে না পাই, পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই সকল ছেলে জুটি।
আহা, হাহা, হা।।'
শিশু ও বালক সম্বন্ধে কবির বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে —
''বালক নিয়ম মানিয়া চলিতে পারে না — সে সম্প্রতি নিয়মহীন ইচ্ছানন্দময় স্বর্গলোক হইতে আসিয়েছে। আমাদের মতো সুদীর্ঘ কাল নিয়মের দাসত্বে অভ্যস্ত হয় নাই, এইজন্য সে ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে সমুদ্রতীরে বালির ঘর এবং মনের মধ্যে ছড়ার ছবি স্বেচ্ছামত রচনা করিয়া মর্ত্যলোকে দেবতার জগৎ —লীলার অনুসরণ করে।''
শিশুর শ্রুতিসুখকর ছন্দ হল, ছড়ার ছন্দ। তাই 'শিশু' এবং 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যে তিনি বাংলা ছড়ার মতই চারমাত্রার পর্ব ব্যবহার করেছেন। সহজ ভাষা, সরল ছন্দ শিশুর মুখে শুনতে ভালো লাগে। এই সারল্যের মধ্যেও কিন্তু একটি আলৌকিকতার ছায়া থাকে। অথচ লৌকিক জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই এর জন্ম। উল্লেখ্য — ''যখন যেমন করি
তাই হতে পাই যদি

আমি তবে এখুখানি হই
ইচ্ছামতী নদী।”
পরিশেষে বলি বিশ্বব্যাপী চরম সঙ্কটের সময় যখন হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব, তখন শিশুদের রক্ষা করতে গেলে, অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হলে, চাই শিশুদের সুস্থ মানসিক বিকাশ। এর জন্যে আমাদের রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করা উচিত। আর প্রয়োজন রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে শিশুকে দেখার শিক্ষা — তাইতো শিশু ভোলানাথকে ডেকে কবির সুরে সুর মিলিয়ে আহ্বান জানাই —
“ওরে শিশু ভোলানাথ, মোরে ভক্ত ব’লে
নে রে তোর তাণ্ডবের দলে
দে রে চিত্তে মোরে
সকল-ভোলার ওই ঘোরে,
খেলেনা — ডাঙার খেলা দে আমারে বলি।
আপন সৃষ্টির বন্ধ আপনি ছিঁড়িয়া যদি চলি
তবে তোর মত্ত নর্তনের চালে
আমার সকল গান ছন্দে ছন্দে মিলে যাবে তালে।”।
.....
গ্রন্থ সূত্র ঃ
১) রবীন্দ্র রচনাবলী - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২) রবীন্দ্র জীবনী - প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়
৩) রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ - প্রমথনাথ বিশী

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com